ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 210-219
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.025

কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের নির্বাচিত ছোটগল্পে রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা

মাসুদ আলী দেওয়ান, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 22.10.2024; Accepted: 29.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Political thinking is shaped by social injustice and deprivation, with the trend of social change developing around the social and economic status of the people. Political consciousness is more evident in rural society. The political atmosphere has been present since the early days of Bengali short story writing. Upon observing the nature of Bengali short stories, it is clear that political consciousness has had a significant influence. Leftist ideologies entered the short story from the earliest days of independence, and their influence gradually waned in the post-independence period, particularly during the sixth and seventh decades of the twentieth century. Abul Bashar is a writer from a different stream in Bengali fiction. He is a prolific writer, known for his storytelling, prose, creativity, and artistic expression. Due to social inequality and financial oppression, he became actively involved in politics. His political involvement allowed him to gain firsthand experience of rural life, bringing him closer to the common people and the land. He spent ten years in politics without contributing to any branch of literature. However, disillusioned with political ideologies, he re-entered the literary world. As a result, politics occupies a significant portion of his stories. These political stories are the product of the experience he gained while being directly involved in politics.

Keywords: Abul Bashar, Political thinking, Social injustice, Social and economic position, Political consciousness.

একবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় কথাসাহিত্যিক হলেন আবুল বাশার। শারদীয় 'দেশ'পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুলবউ' উপন্যাস তাঁকে পাঠকদের কাছে পরিচিতির পাদপ্রদীপে নিয়ে আসেন।তাঁর বেশির ভাগ গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ জনজীবনকে অবলম্বন করে। মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ অঞ্চলের জনজীবন, দালাদলি, সম্প্রদায়-সাম্প্রদায়িকতা, মানুষ ও মানবিকতা আবুল বাশারের গল্পে স্বমহিমায় উঠে এসেছে। তাঁর গল্প কাহিনীর বহিরঙ্গের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন সমাজ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তেমনই গল্পের অন্তরঙ্গে প্রচ্ছন্ন আছে রাজনীতি। তাঁর গল্পের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে দেশ-কাল-সময়ের চিহ্ন। সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পকার আবুল বাশার তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রগুলির মধ্যে সহজাত সংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাসের সাথে মিশে থাকে এক ধরনের হতাশা, নৈরাজ্য, বিচ্ছিন্নতা ও বিপন্নতা।আর সেই বিপন্নতার সাথে সম্পৃক্ত সময় ও রাজনীতি। 'রাজনীতি' শব্দটি অত্যন্ত জটিল এবং বহুল প্রচারিত একটি বিষয়। অল্প

সংখ্যক মানুষের দ্বারা সার্বজনীন কল্যাণ ও চেতনাকে প্রকাশ করাই হলো রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় রাষ্ট্রশক্তিকে নিজেদের অধিকারের আনতে গিয়ে দলাদলি, নতুন আইন প্রণয়ন, নিজ স্বার্থে সেই আইনকে শোষণ ও শাসন যন্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে। আবুল বাশার মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র যে কেবলমাত্র অত্যাচারের যন্ত্র, ক্ষমতা অধিকার করায় তার মূল লক্ষ্য- মার্ক্সবাদের এই নীতিকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন রাজনীতি গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠা ও মার্ক্সের সাম্যবাদের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাবে। এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের ভাবধারা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্টরা ইংরেজ শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিল। শ্রমজীবি মানুষরা নিজেরাই তাদের নিজস্ব ভবিতব্যের নির্ধারক করতে পারবে, এমন এক সমাজ গঠনের সংকল্প নিয়েছিলেন কমিউনিস্টরা।কমিউনিস্ট সমাজের মূল ভিত্তি হলো রাষ্ট্রহীন, শ্রেণীহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। অত্যাচার, স্বৈরাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হলো কমিউনিস্ট আন্দোলন। হাজার হাজার আত্মত্যাগী যুবক সমতাবাদী ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জীবন উৎসর্গ করেন। সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বর্ণ বৈষম্যে, স্থানীয় কৃষকদের সংকট মোচন প্রভৃতি বিষয়ে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টরা আন্দোলন গড়ে তোলেন। সমাজে প্রান্তিক, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের নিরাপদ বসবাসযোগ্য গড়ে তুলে সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনার পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের সমাপ্তি ঘটানো এবং একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মাটিতে কমিউনিস্টদের শিকড় গাঁথা রয়েছে। শোষিত, বঞ্চিত মানুষ ও জাতির অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তারা সর্বদা সোচ্চার করে গেছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে স্থানীয় নেতারা এক ভয়ঙ্কর রূপ নিতে শুরু করে। ক্ষমতায় থাকা কিছু নেতা ও মন্ত্রী নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের দ্বারা পার্টিকে কালিমালিপ্ত করেন। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, নিজেদের আখের গোছানোর প্রবৃত্তি দিনে দিনে নেতাদের মধ্যে বাড়তে শুরু করে। বেনামে ব্যবসা করা, নিজের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া, অসাধু ব্যবসায় মদত দেওয়াতে সি পি আই(এম) নেতাদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে পড়ে। শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি বামফ্রন্ট সরকার পড়ে যাওয়ার পিছনে একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। জমি অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে শিল্পের জন্য জোর করে জমি গ্রহণ করার চেষ্টা করা হলে বিরোধীরা এক বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলেন ।কৃষকদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করে তাদের সম্মতি না নিয়ে, ন্যায়সম্মত কোনো ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই বামফ্রন্ট সরকার জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করেন। জনগণ সরকারের জমি অধিগ্রহণে বাধা দিতে গেলে পুলিশি অত্যাচার শুরু করা হয়। নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে চোদ্দ জন নিরীহ জনগণের প্রাণহানি ঘটে। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বড়ো কোন দুর্নীতির অভিযোগ না থাকলেও, সেই সরকারের বিরুদ্ধে আনা সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল দলতন্ত্র, স্বজনপোষণ ও দাম্ভিকতা। যতদিন এগিয়ে গিয়েছিল, ততই এই তিনটি বিষয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে লাল পার্টির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গল্পকার আবুল বাশার প্রথম জীবনে বামপন্থী দলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি সাহিত্যচর্চা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর যৌবনের একটা অংশ রাজনীতির পিছনেই কাটিয়ে দেয়। যে রাজনীতি শোষিত, লাঞ্ছিত ও অসহায় মানুষদের কণ্ঠ হয়ে সমাজ বিল্পবের কথা বলত, আপন স্বার্থসিদ্ধির কথা না ভেবে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলত, আবুল বাশার সেই রাজনীতিতে বিশ্বাসী

ছিলেন। লেখন কোন ভোগী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই রাজনীতির মধ্যে পরিবর্তন আসে, দলীয় নেতারা নানা দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, যা লেখককে খুবই ব্যথিত করে তোলে। ফলে একসময় তিনি সেই রাজনীতি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আর সেই রাজনীতি সাথে জড়িয়ে থাকতে গিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তারই ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর গল্পে। আবুল বাশারের অনেক গল্পে উঠে এসেছে বামপন্থী নেতাদের দুর্নীতি, দলীয় রাজনীতি ও নিজেদের স্বজনপোষণের কথা।তাঁর গল্পে অবহেলিত, লাঞ্ছিত এক সম্প্রদায় তাদের জীবন, গল্প নিয়ে হাজির হলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

'চন্দ্রদীপ' গল্পে বামপন্থী দলের কর্মী জীবনের এক করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। গল্পে বামপন্থী কর্মী হিসেবে চন্দ্রদীপ নামক এক কেন্দ্রিয় চরিত্রের কথা ব্যক্ত হয়েছে। রাজনীতির ঘোর আবর্তে পড়ে চন্দ্রদীপের জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় 'চন্দ্রদ্বীপ' গল্পে পাওয়া যায়। লাল পার্টি করার অপরাধে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ানো পুলিশের হাত থেকে বাচার লক্ষ্যে চন্দ্রদীপ নানা নামধারন করেছে, নানান পরিস্থিতিতে কোথাও রছুল মিঞা, কোথাও মুরারী, কোথাও জিতেন আবার কোথাও বা জয়দেব পরামানিক নামধারণ করেছে। চন্দ্রদীপের কোথাও রছুল মিঞা ও কোথাও মুরারী নামধারনের মধ্য দিয়ে লেখক আবুল বাশার রাজনীতির পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যের বার্তাও দিতে চেয়েছেন। আসলে রাজনীতির মোহে পড়ে কিছু মানুষ অনেক সময় একে অন্যের অনিষ্ট সাধনে যুক্ত থাকেন। গল্পের শুরুতেই গল্পকার আবুল বাশার গল্পের নায়ক চন্দ্রদীপের মধ্য দিয়ে মিস্টার জেড নামক এক বিপ্লবীর কথা তুলে ধরেছেন।মিস্টার জেডকে ধরার জন্য সে দেশের সরকার এই ফরমান জারি করেন যে, তাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কৃত করার খবর শুনে মিস্টার জেড দেশ ছেড়ে গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আত্মগোপনের পরিকল্পনা করে। কিন্তু সীমান্ত এলাকার সীমান্তরক্ষীরা কড়া পাহারায় রত থাকায় মিস্টার জেড সীমান্ত পার হওয়ার সময় রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে যায়। সীমান্তরক্ষীরা তার সম্পূর্ণ শরীর তল্লাশি করে। পরিশেষে মিস্টার জেডের কাছ থেকে কিছু না মেলায় রক্ষীরা তাকে দেশদ্রোহী বলে সন্দেহ করে। কিন্তু নানা কথার ছলে রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন।এখানে গল্পকার মিস্টার জেডের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের এক বার্তা দিতে চেয়েছেন।

মিস্টার জেডের এই গল্পটি কিভাবে চন্দ্রদীপের চলার পথে একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছে, তা গল্প আলোচনা করলেই অনুধাবন করা যায়। চন্দ্রদীপ যেন এক মরুযাত্রী, যার যাত্রাপথের কোন শেষ নেই। তার কাছে একমাত্র সঙ্গী হিসেবে রয়েছে মিস্টার জেডের গল্পটি। এই গল্পটি চন্দ্রদীপের কাছে মরুপথের উদ্যান। জলের উৎসের মতো গল্পটি চন্দ্রদীপের জীবনকে সতেজ করে রেখেছে। লাল পার্টির রাজনীতিতে (কমিউনিস্ট পার্টি) জড়িয়ে পড়ে চন্দ্রদীপ সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গল্পের নায়ক চন্দ্রদীপ মিস্টার জেডের গল্প থেকে একথা জানতে ও বুঝতে পারে যে, একজন বিপ্লবী তার আশ্চর্য উন্নত মাথাটি সারাজীবন বহন করে নিয়ে চলে। পুলিশ আর সরকারি গোয়েন্দার সতর্ক চোখ তাকে সর্বদা তাড়া করে চলে। এমত সময় মিস্টার জেডের গল্প ছাড়া চন্দ্রদীপের কাছে আর কিছু ছিল না, যা থেকে সে বাঁচার রসদ পাবে। রাজনীতির আবর্তে এসে সংসার জীবনের সাথে চন্দ্রদীপের প্রত্যক্ষ যোগ নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ও লোকাল কমিটির সাথেও তার আর কোন যোগ থাকে না। তার পার্টি যেন দর্পণ চূর্ণের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, যে দর্পণে মুখ দেখলে শুধু গ্লানি অনুভূত হয়। চন্দ্রদীপের বিশ্বাস গল্পটি যতদিন তার কাছে থাকবে, ততদিন সে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে না। সে মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস পোষণ করেন যে, তার পার্টির নেতাদের সঙ্গে পুনরায় আবার কোন একদিন যোগাযোগ করে উঠতে পারবেন। এখন চন্দ্রদীপ যে এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছে, সেই চর এলাকায় জনবসতি কম। এই চর

এলাকার একপাশে একটা পুলিশ ফাঁড়ি থাকলেও তার লক্ষ্য চোরামাল চালান এবং সীমান্তের ওপারে গরু চালানের দিকে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে চন্দ্রদীপ চর এলাকায় রছুল নামধারণ করে খেতমজুরের বেশে আত্মগোপন করে থাকে। পেশায় খেতমজুর রছুল ওরফে চন্দ্রদীপ লুঙ্গি পড়ে, পায়ে টায়ারের চটি, বেনিয়ান ধরনের জ্যাকেট গায়ে, ঘাড়ে গামছা রেখে একজন সত্যিকারের খেতমজুরের রূপ ধারণ করে। নগেনের কথায়, চন্দ্রদীপ যতই নিজেকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লালকে নাল বলে কৃষক হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, আসলে কৃষক হওয়ার পরীক্ষা যে বড় কঠিন। নগেন তাকে খুব সাবধানে থাকতে বলেছে, কেননা চর এলাকায় খুব ঘনঘন কালো গাড়ি অর্থাৎ পুলিশের গাড়ি আসা-যাওয়া করছে। খেতমজুর সেজে থাকা রছুল মিঞা আসলে রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী ।এই বিশ্বাস কোন ব্যক্তি চন্দ্রদীপের না, বিপ্লবী চন্দ্রদীপের। সে বাবু সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাকে খুব আদর করে। সাধারণ মানুষের এই ভালোবাসায় চন্দ্রদীপ চর এলাকায় থাকার জন্য মাটির কোঠাবাড়ির উপরতলার একটি ঘর পেয়ে যায়। চর এলাকায় থাকতে গিয়ে অনেক মুরুব্বি রসিকতার সুরে চন্দ্রদীপকে বিয়ে করে সংসার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মাছ যেমন জলের ভিতর থাকে, বিপ্লবী থাকবে জনগণের ভিতর- মা-ও-জে-দং এর এই উপমা অনেক ক্ষেত্রে বিফল হলেও সর্বত্র বিফল হয়নি, কেননা চন্দ্রদীপ এখন রছুল মিঞা।

নগেন নামক চরিত্রের বলা উক্তির মধ্য দিয়ে গল্পকার আবুল বাশার বিপ্লবী ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। নগেনের কথায়- ---

> ''দ্যাশে কি বিল্পব হবে রছুল ভাই? কত জান নষ্ট করলে তোমরা! কত মাথাঅলা সোনার চাঁদ বলি হয়ে গেল।''[১]

ঝিঙেদহর মোড়ে এক কমরেডকে কোন কারন ছাড়াই পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেন। কোন অপরাধ ছাড়াই লাল পার্টির দুইজন কর্মীকে পুলিশ জেলে পুরে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। এই সব দামাল ছেলেদের সংসার, বাবা-মা ছিল কিন্তু বিপ্লবের আবর্তে এসে সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়। চন্দ্রদীপের কথায় জনগণই যার ঠিকানা তার আবার সংসার কিসের দরকার। চন্দ্রদীপের দলে প্রবেশ করতে গেলে মৃত্যুর টিকিট কাটতে হয়, কেননা মৃত্যু হল তার দলের এন্ট্রি ফ্রি। চন্দ্রদীপের কথায়, তারা এভাবে মৃত্যুবরণ না করলে জনগণ তাদের বিশ্বাস করবে না। তারা যখন দলে এসেছিল, তখনই তারা একটি শপথ করেছিল যে বাবা মায়ের দেওয়া রোমান্টিক নামটা তারা ভুলে যাবে। রছুল মিঞা নামটির ভিতরই চন্দ্রদীপ নিজেকে খুঁজে বেড়িয়েছে বা অনুভব করেছে। আপন মনে চন্দ্রদীপ চরের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চরের ফাসিতলায় এসে হাজির হয়। ফাসিতলা নাম শুনেই চন্দ্রদীপের গা ছমছম করে ওঠে। জায়গাটা শীতল আর ভয়ানক নির্জন। এখানে কার ফাঁসি হয়েছিল এবং কেন ফাঁসি হয়েছিল তা কারো জানা নেই। ফাসিতলায় এসে চন্দ্রদীপের মনে ভয় না জাগলেও গভীর নির্জনতা চলে আসে।

ফাঁসিতলার ডোবার উপরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটি মৃতদেহ চন্দ্রদীপ দেখতে পায়, কাছে গিয়ে মৃতদেহটি চিত করতেই দেখেন সেটি মেটে সেখের মৃতদেহ। এই মৃতদেহ দেখে ভয়ানক চমকে যান চন্দ্রদীপ। মেটে সেখের এই মৃতদেহটি তাকে অনেকটা ভাবিয়ে তোলে। এরপর সে বুঝতে পারেন যে, তাঁর এই রছুল মিঞা নামের পাশাপাশি তাকে এই জায়গা অর্থাৎ চর এলাকা ছাড়তে হবে। রাতে ঘুমোতে গিয়ে তার বারবার মেটে সেখের কথা মনের অজান্তে মনে পড়ে যায়। কেননা তারই আদর্শের ছোঁয়ায় মেটে সেখ জিতেনপুরে পার্টির সংগঠন গড়ে তোলেন। বিড়ি বাধা একজন সাধারন মানুষ তারই আদর্শের ছোঁয়ায় অনেক বদলে গিয়েছিল। জিতেনপুরের বিড়ি শ্রমিকের মধ্যে তার প্রভাব অনেকটা ছিল। রছুল ওরফে চন্দ্রদীপ অনুমান করেন, তাকে কোন সংবাদ দেওয়ার জন্য মেটে সেখ চর এলাকায় আসার সময় পুলিশ তাকে পিছু ডেকে ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন। এরপর সে মনে মনে ঠিক করে নেয়, সে এখন থেকে আরও রছুল মিঞা নয়, সে এখন জয়দেব পরামানিক। তার পরিচয় হবে সে নিমগাঁয়ের লোক।চন্দ্রদীপ

ক্রমাগত নাম পরিবর্তন করতে গিয়ে এবং সেই নামধারনের মধ্যে থাকতে থাকতে গিয়ে বুঝতে পারে যে, তার একটা স্থায়ী বা নির্দিষ্ট নামের দরকার। কেননা তার দল আজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ায় সে একা এবং জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার মন আজ যেন কোথাও ফিরতে চাইছে। চন্দ্রদীপ তার বুকে জমা কষ্ট নিয়ে পার্টির কোনো নেতাকর্মীকে পাওয়ার আশায় পার্টির গোপন ঠিকানাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগে। কিন্তু সব জায়গা যেন জনশূন্য, কোথাও কারো দেখা নেই। এমত অবস্থায় চন্দ্রদীপ যেন তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করেন। সে বুঝতে পারে, তার আর বাড়ি ফেরা হবে না, মার সঙ্গে দেখা হবে না। সে আরও ভাবতে লাগে, সে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তারা হয়তো তাকে চিনতে পারবে না। তার জীবনের গতি হয়তো হারিয়ে যাবে, তার হয়তো আর চাকরি হবে না। তার বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য পুলিশ ধরলে তাকে যে কত বছর কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে থাকতে হবে তারও কোনো হিসাব নেই। ঠিক এমন সময় চন্দনার কথা তার মনে পড়ে যায়। চন্দনার আর এক নাম ছিল বুড়ি। চন্দ্রদীপকে সে দীপদা বলে ডাকত। চায়ের দোকানের আলোচনা থেকে জানা যায়, পুলিশ কিভাবে বিপানকে বটতলার নিচে ধুনুরিদের মধ্যে থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিপান খুব মিশুকে ছেলে ছিলেন। যার সুবাদে সহজে ধুনুরিদের সাথে মিশে গিয়ে ছিলেন।পুলিশ পাগলা শেয়ালের মত তাকে খুঁজতে লাগলে সে বটতলায় ধুনুরিদের চটের উপর গিয়ে বসে পড়ে। হাতে তুলে নেয় ধোনার যন্ত্র এবং তুলো পেজিয়ে ওঠে তার ধুনে। সেই সময় বিপানের এই রূপ দেখে পুলিশ কখনই তাকে চিনতে পারত না কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলের কেষ্টবিষ্টুর দল তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। প্রকাশ্য রাস্তার উপরে কেষ্টবাবুরা পুলিশের সামনে বিপানের গালে চড় মারেন এবং চোখে অ্যাসিড ঢেলে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দেয়। চায়ের দোকানের বিপানের এই করুণ পরিণতির কথা শুনতে গিয়ে চন্দ্রদীপের শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে উঠে। সে নিজেকে জাতি-ধর্ম, গোত্রহীন, গৃহহীন, পথহারা মানুষ ভাবতে শুরু করে। কারন সে বিপানের মত তার সুন্দর চোখ দুটি হারাতে চায় না। কেননা এই চোখ দিয়ে সে বিপ্লবের অগ্নিক্ষরা অক্ষরগুলো পাঠ করেছে, কাব্য সাহিত্য পাঠ করেছে, ভারতবর্ষের দুঃখ, দারিদ্রকে দেখেছে, সর্বোপরি তার এই চোখ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু শেষমুহূর্তে চন্দনার পিছু থেকে ডেকে উঠলে, সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। 'চন্দ্রদীপ' গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার একজন ফেরারি বিল্পবির কথা বলতে চেয়েছেন। রাজনীতির সাথে জড়িয়ে থাকতে গিয়ে একজন বিল্পবীর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে, গল্পকার আবুল বাশার তাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

'একটি রক্তাক্ত ভুল' গল্পে আবুল বাশার রাজনীতির এক কদর্য রূপ তুলে ধরেছেন। আমাদের চারিপাশে যেসব সমস্যা হঠাৎ জেগে উঠে কোন শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে ব্যাহত করে তার সমাধান করাই হল রাজনিতি।ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রেখে কাছে টেনে নেওয়া রাজনীতির অঙ্গীকার হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তেমনটি লক্ষ্য করা যায় না। কেননা এই অঙ্গীকার পূরণ করতে গেলে কোথাও কোন সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, বঞ্চনা, নীচ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে না, কিন্তু বাস্তবে সেটি সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত অসহায় ভরা দৃষ্টি নিয়ে দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির কদর্য রূপ দেখে চলেছি। গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য এমন এক নেতৃত্বের প্রয়োজন, যার উদারতা হবে আকাশের মতো। যেখানে কমরেড নামক নেতারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে এক তরতাজা সতেজ প্রাণকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়।আলোচ্য গল্পে তেমনই কিছু ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র প্রতুল, যার উপস্থিতির গল্পের শুরুতে লক্ষ্য করা যায়। প্রতুলের দাদা অতুল, যিনি সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত। গল্পের নায়ক প্রতুলের বাল্যকালের বন্ধু গৌতম, যার ডাকনাম ছিল গোরা। সাবলীল ও স্বতস্ফূর্ত বন্ধুত্বের রূপ প্রতুল ও গোরার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাদের বন্ধুত্বের মাঝে অর্থ ও সামাজিক কোন প্রতিপত্তি বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। গোরার পরিবার আর্থিক দিক থেকে অনেক দুর্বল হওয়ায়

গোরা কখনো অন্যের সামনে নিজেকে জাহির করতেন না, সব সময় যেন মাথা নিচু করে চলতেন। প্রতুলের বলা সকল কথা গোরা একজন ভালো শ্রোতার মতো শুনতেন। গোরা সর্ব সময় প্রতুলের পাশে পাশে থাকতেন। একটি মুহূর্তে সে যেন প্রতুলকে না দেখে থাকতে পারতেন না। কোন কথার অবাধ্য না হওয়া গোরাকে প্রতুল ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়, যা কোন মতেই গোরা বুঝতে পারেনি। কমরেড অতুলের দ্বারা ডাকা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রতুলের সাথে গিয়ে গোরা মৃত্যুবরণ করে। গোরার সেই মৃত্যুর দিনটিকে পার্টি তার নিজের সুবিধার কথা ভেবে শহীদ দিবস হিসাবে পালন করতে লাগে।

গোরার বোন শঙ্খমালা, গল্পের মধ্যে নিমা নামে যার বেশি উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় ছোট থেকেই নিমা মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। অনার্স সম্পূর্ণ করে টিউশন পড়িয়ে নিজের এবং মেস ভাড়ার খরচ কোনভাবে জোগাড় করত। একটা চাকরি পাওয়ার তাগিদে মন্ত্রী অতুলের সাথে দেখা করার বাসনা নিয়ে প্রতুলের কাছে আসার মধ্য দিয়ে গল্পে প্রথম নিমার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতুলের দাদা অতুল ভোটে জিতে মন্ত্রী হয়েছে। নিমার ভাবনা, প্রতুল যদি একবার তাকে দাদা অতুলের কাছে নিয়ে যায়, তবে তার একটা চাকরি হয়ে যাবে। আর এই আশায় নিমা প্রতিনিয়ত প্রতুলকে তার দাদার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে থাকেন। প্রতুল দাদা অতুলের উগ্র রাজনীতিকে পছন্দ না করায় দাদার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে পিসির বাড়ি এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাই সে কোনমতে নিমাকে অতুলের কাছে নিয়ে যেতে পারে না। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গল্পের শুরুতেই প্রতুলের চোখের জলের প্রসঙ্গ উঠে আসে। যেখানে তার মনে হতে লাগে, তার চোখের জলের কানাকড়ি দাম নেই। চোখে বারবার জল চলে এলেও সেই অবাধ্য জলকে কোথাও লুকিয়ে রাখার মতো জায়গার খোঁজ প্রতুলের জানা ছিল না। রাজনীতির মোহে পরে প্রতুল তার প্রাণোধিক বন্ধু গোরাকে হারিয়ে ফেলে। গোরা তাকে অন্ধের মত বিশ্বাস করত। প্রতুল বাধ্য ছেলের মতো গোরাকে নিজের ইচ্ছে মতো যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে চলত, সেও কোন প্রশ্ন না করে প্রতুলের সাথে চলে যেত। আজ সেই গোরায় প্রতুলের কাছ থেকে অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছে, যা ভাবতে গেলে প্রতুলের খুব কষ্ট হয়। গোরার মৃত্যুর জন্য প্রতুল নিজেকে দায়ী করতে থাকে, যার ফলে সে আর গ্রামে ফিরে যায় না। রাজনীতিকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। দাদা অতুলের রাজনৈতিক ভাবনাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে প্রতুল, যার ফলে দাদার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। ভোটে জিতে অতুল উপমন্ত্রী হয়। আর এই মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে প্রতুল অনায়াসে নিজের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে নিতে পারত। কিন্তু প্রতুল সেই সুযোগ গ্রহণ করেনি। সে তার জীবন যাপনের জন্য যৎসামান্য উপার্জন করেন, যে কাজ করে উপার্জন করে তা বলার মতো বা উল্লেখ করার মতো নয়। গোরার মৃত্যুকে নিয়ে প্রতুলের বুকে জমে ওঠা কষ্টের কথা নিমাকে বলতে থাকে। যতদিন গেছে বন্ধু গোরার জন্য প্রতুলের কষ্ট যেন ততই বেড়ে চলেছে, যার জন্য প্রতুলের মাঝে মাঝে নিজেকে পাগল পাগল মনে হয়। চাকরি চাইতে আসা নিমাকে প্রতুল নানাভাবে তার বুকে জমে থাকা কষ্টের কথা শোনাতে চাইলে নিমা তার সেই কষ্টের কথা ততটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না, যতটা প্রতুলের ভাবনায় আসে। প্রতুলের গ্রাম সীতানগর, সেখানেই তার দাদার বেড়ে ওঠা। আজ সেই অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে অতুল মন্ত্রী হয়েছে। অতুল চিরকালই খুব দাপুটে নেতা ছিল। আর এই দাপুটে হওয়ার কারণে কোনদিনই প্রতুল তার দাদাকে সহ্য করতে পারত না। যেখানে প্রতুলকে বলতে শোনা যায়-

''দাদার সংগ্রামী রাজনীতির গ্রাম বাংলায় অনেক রক্ত ঝরিয়েছে, অনেকে গ্রামেই শহীদ আছে।''[২]

কমরেডরা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে সেই শহীদ যুবকদের শহীদস্তম্ভ তৈরি করেছে। এই শহীদরাই যেন প্রতুলকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেয় না অর্থাৎ কিছু সুযোগ সন্ধানী কমরেডদের কথার মোহে পড়ে যেসব

সহজ-সরল ছেলেরা তাদের বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছে, তাদের কথা ভেবে প্রতুল গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না।

একই রাজনৈতিক সত্তা কিভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে তা গল্পকার আলোচ্য গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। রাজনীতির মোহে পড়ে অতুল নিজ গ্রাম ও পরিজনদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। দাদা গোরার মৃত্যুর বিনিময়ে বোন নিমা মন্ত্রী অতুলের কাছে চাকরির দাবি করে।নিমার এই চাকরি চাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পকার একদিকে যেমন নিমার অসহায় জীবনের কথা তুলে ধরেছেন, অপরদিকে নিমার লোভী মানসিকতারও কিছুটা পরিচয় ফুটে উঠেছে। আবুল বাশারের সুক্ষ্য তুলির টানে অতুলের মধ্যে থাকা রাজনীতির মোহ এবং নিমার লোভী মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। 'একটি রক্তাক্ত ভুল' নামকরণের মধ্য দিয়ে গল্পকার আবুল বাশার কিছু রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটি সামগ্রির আলোচনা থেকে সহজে অনুধাবন করা যায়, গল্পটির সর্বাঙ্গ জুরে রাজনৈতিক সত্তা ফুটে উঠছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রতুলের মধ্যে, নিমার চাকরি পাওয়ার মধ্যে, মন্ত্রী অতুলের সাথে ভাই প্রতুলের সম্পর্ক বিচ্ছেদের মধ্যে, শান্ত স্বভাবের ছেলে গোরার মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পে রাজনৈতিক ভাবনা ফুটে উঠেছে।

গল্পকার আবুল বাশার 'বড় জোর দুই মাইল' গল্পে বামপন্থী এক মুসলমানের কথা ফুটে উঠেছে। শরিয়ত হাজির বাড়ি রাজনীতির প্রধান। গল্পে এক বিচিত্র ও জটিল মৃত্যুর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইমরান নামক এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গল্পটি তার পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। ইমরানকে কে বা কারা খুন করেছে? কি উদ্দেশ্যে খুন করেছে? সেই বিষয়টিকে নিয়ে গল্পে এক জটিল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেকে মনের মধ্যে এই খুনের কারণ হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে দায়ী করে থাকে। ইমরানের খুনের তদন্ত ভার যার উপর পড়েছে, সে হল গৌরাঙ্গ ওরফে গোরা দারোগা, যাকে অনেকে চারি আনার দারোগা বলে থাকেন। গোরা দারোগার ভালো নাম হল গোরা মুখুজ্জে। পুলিশের চাকরিতে প্রবেশ করার আগে তিনি সাহারানপুরের হাইস্কুলের ফিলজফির শিক্ষক ছিলেন। ইমরানকে খুন করে প্রথমে তার শরীর থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে, পরে সেই মাথাটি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। ইমরানের সেই প্রকাণ্ড পরিণত মাথাটা ঘাতকরা কেন সরিয়ে ফেলল? কি কাজেই বা মাথাটা লাগবে? এইসব নানা প্রশ্ন অনেকের মনে জাগতে শুরু করে। অবশ্য এই ধরনের মার-মৃত্যু ষড়যন্ত্র যখন হয়, তখন মাথা একদিকে আর শরীর একদিকে পড়ে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে এটি যে সামান্য ডাকাতির ঘটনা নয়, তা বলাই বাহুল্য। যে খুনটি যে প্রচন্ড বিদ্বেষবশত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকের ধারণা কাঁথাউড়ির মাহেশ্বরা নয়তো ঘোষেরা গোপনে লোক লাগিয়ে ইমরানকে খুন করেছে। যদিও ইমরানের এই খুন নিয়ে অনেকের মধ্যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়। ইমরানের হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে গোরা দারোগার যেন হতবুদ্ধি হওয়ার মত অবস্থা হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলে মানব জীবনে নানা বিপর্যয় নেমে আসে। উগ্র ধর্মীয় ভাবনায় ভাবিত কিছু মানুষের সাথে রাজনৈতিক নেতারা যোগ দিয়ে নিজেদের স্বার্থের জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক –সামাজিক- সাংস্কৃতিক জীবনের উপর দাঙ্গার প্রভাব পড়ে। বহু ধর্ম, জাতি ও বর্ণের দেশ ভারতবর্ষে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাস করে, আবার সময়ে সময়ে ধর্ম, ভাষা কিংবা জাতিকে কেন্দ্র করে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে। ইমরান একবার বন্দুক উঁচিয়ে কাঁথাউড়ির মাহেশ্বদের মারার জন্য তেড়ে গিয়েছিলেন। তার সেই তেড়ে যাওয়ার কথা বাতাসের গা থেকে বৃষ্টির ফোটার মত ঝরে পড়ার আগেই সে খুন হয়ে যায়। মাত্র তিন মাস আগে জিন্নাতন বানুর সঙ্গে ইমরানের বিয়ে হয়। নিলামপুরের দৌলত কাজীর মেয়ে জিন্নাতন, তার ডাকনাম জিনু। তাদের বিয়েতে গোরা দারোগার নিমন্ত্রণ থাকলেও সে বিশেষ এক কারণে আসতে পারেননি।আজ এসেছেন ইমরানের মৃত্যুর তদন্তভার নিয়ে।মাথাচ্ছেদ স্বামীর হাতখানি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে জিন্নাতুন তুলে নিয়ে বসে

আছেন। কত না নিপুন ভালোবাসায় স্বামীর নখে নেলপালিশের রঙ লাগিয়ে ছিলেন জিন্নাতন, তখন ইমরান জীবিত ছিল।তার কোলের উপর স্বামীর হাতখানা সমাদরে পড়ে আছে। ইমরানের মৃত্যুতে তার সেই যৌবন যেন দমকা হাওয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে।

হাজী শরিয়ত একজন বামপন্থী মুসলমান। তার বাড়ি বামপন্থী রাজনীতির প্রধান আশ্রয় হওয়ায় পঞ্চায়েত প্রধান এই বাড়িকে মান্য করে চলেন। চৈতালীর বলা, একক ব্যক্তি ইমরানকে খুন করেছে, এই কথাটি কোন মতেই পঞ্চায়েত প্রধান মেনে নিতে পারেন না। যার ফলস্বরূপ প্রধানকে ক্ষিপ্ত গলায় বলতে শোনা যায়,তিনি কাঁথাউরিকে প্রটেকশন দিচ্ছেন। প্রধানের মতে তিনি একজন কমিউন্যাল লোক,কেননা একজন খুন করেছে বলে দিয়েই সেই একজনেরই ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মাহেশ্বদের খালাস করতে চাইছেন। তার মতে, এটা একটা পলিটিক্যাল মার্ডার, মাহেশ্বদের কাছে সে ঘুষ খেয়েছে। গোরা দারোগা একজন হিন্দু হয়ে আরেকজন হিন্দুকে বাঁচাতে চাইছেন, আর সে কারণেই তাদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছেন। তার মতে ইমরানের খুন এক রাজনৈতিক খুন, কেননা তার পরিবার সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত। আর এই রাজনীতির কারার কারণে তাকে খুন হতে হয়েছে। বামপন্থী হওয়ায় বিদ্বেষবশত ইমরানকে খুন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান কিছুটা হুমকির সুরে গোরা দারগাকে বলেন, যদি ইমরানের খুনের কারণে মহেশ্বদের না ধরে থানায় আটক করেন, তবে জনমত নির্বিশেষে নয়ানজুলির লোকেরা তার বিরুদ্ধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবেন।পঞ্চায়েত প্রধানের এহেন অভিযোগের কথা শুনে গোরা দারোগার ভাবনায় আসে---

> ‘‘মাথায় ইলেকশন ছাড়া এসব লোকের কিছুই থাকে না। ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতা এদের এখন আশ্রয়স্থল। উটপাখি যেমন বালিতে মুখ গোঁজে, হাতে লালঝান্ডা নিয়ে এরাও এখন ধর্মে মুখ গুঁজে সাম্প্রদায়িকতার বালিঝড় ওড়াচ্ছে।’’[৩]

প্রধান মহাশয় তার কথার মধ্য দিয়ে সবকিছুকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পঞ্চায়েত প্রধান বারবার গোরাকে ঘুষ নেওয়ার কথা বলতে থাকলে, প্রধানের এহেন অযৌক্তিক কথা শুনতে শুনতে স্বামীর হয়ে চৈতালী তার প্রতিবাদী গলায় বলে উঠে, তার স্বামী ঘুষ কখনো দু’চোখে দেখেননি, সে স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন।

গল্পের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রাজনৈতিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। ইমরানের পরিবার লাল পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক। হাজী শরিয়ত সাহেবকে সকলে সমীহ করে চলে। নিজ কর্মকাণ্ডের দ্বারা ধ্বংস ডেকে আনা এক পরিবারকে বাঁচানোর জন্য পঞ্চায়েত প্রধানের বলা কথায় মধ্য দিয়ে লাল পার্টির (বামফ্রন্ট) স্বজনপোষণের বিষয়টি গল্পকার আবুল বাশার তুলে ধরতে চেয়েছেন। বেশ কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের কথা ফুটে উঠেছে। সেই দিক থেকে ‘বড় জোড় দুই মাইল’ গল্পকে রাজনৈতিক গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

গল্পকার আবুল বাশার তাঁর ‘হিংসার উৎস’ গল্পে ক্ষমতাতন্ত্রের একটি অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুই রূপের পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। হরচৌধুরী নামক বিধায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের এক কদর্য রূপ ফুটে উঠেছে। যাকে কেন্দ্র করে গল্পটি তার পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে, তিনি হলেন ফাটা মঘাই ওরফে কেশব।ফাটা মঘাই হলের একজন পেশাদার খুনি। এম.এল.এ হরচৌধুরীর বডিগার্ড হিসেবে তাকে বহাল করা হয়। মঘাই যে হরচৌধুরীর বডিগার্ড সেকথা লেবুতলার কোন মানুষ বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। মঘাইয়ের গ্রামের বটম দাদা তাকে এই কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। তার নামে তেরোটা খুনের মামলা থাকার কথা জেনেও এম.এল.এ সাহেব বডিগার্ড হিসেবে নিয়োগ করেন। পুলিশের ভয়ে মঘাইয়ের গ্রামে থাকা বেশ বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসবে। মঘাই জানত, হরচৌধুরী একজন সৎ মানুষ, বাড়ি ছেড়ে দূর গাঁয়ে থেকে মানুষের জন্য কাজ করা জনসেবক। এমন সৎ ব্যক্তি তাকে কেন বডিগার্ড হিসেবে নিয়োগ করলেন, তা মঘাই বুঝে উঠতে পারে না। মঘাইয়ের ভালো নাম হল কেশব। হরচৌধুরী তাকে কাজে নিয়োগ করে বুলেট মোটরবাইকের পিছনে বসিয়ে নিয়ে বলে উঠে,সে কেশবকে তার দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োগ করেছে, এর আগে সে এইভাবে কাওকে কোন কাজ দেয়নি। কেননা তার কোন দেহরক্ষী লাগে না। বিধায়ক হরচৌধুরীর এক ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাইরে ভালো মানুষের মুখোশে ভিতরে নিজ চাহিদা পূরণের জন্য অন্ন নামক নারীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন। নিজের রাজনৈতিক পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে বিধায়ক মশাই দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রেখে অন্নকে ভোগ করেছেন। তার উপর যেন কোন আঘাত না আসে তার জন্য কেশব নামক এক পেশাদার খুনিকে নিজের দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। এবং শেষে নিজের পথের কাটাকেপরিষ্কার করার লক্ষ্যে দরবেশকে হত্যা করে তার দায় কেশবের ঘাড়ে চাপিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।বিধায়ক হরচৌধুরীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার রাজনৈতিক নেতার কদর্য চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'কারাগার' গল্পে গল্পকার আবুল বাশারের রাজনৈতিক ভাবনা পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির এক বিশেষ দিকের কথা তুলে ধরেছেন। এই পার্টিতে থাকা উগ্র মেজাজের ছেলেরা যে পার্টির বোল্ড ক্যাডার তারও কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। বরুণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বা তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পার্টির বোল্ড ক্যাডারের এক ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে উঠেছে। পার্টির নেতারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে এই ক্যাডারদের তৈরি করে থাকেন। পার্টির প্রয়োজনে এই সব ক্যাডাররা কোন কিছু না ভেবে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দেয়। তাই পার্টি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, এইসব উগ্র মেজাজের ক্যাডারদের যত্ন করে পুষে থাকেন। এই গল্পের নায়ক প্রমিথের বিবাহিত জীবনে পার্টির ক্যাডার রূপী বরুণ কিভাবে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে, তারও পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের নায়িকা দীপিতাকে বরুণ জোর করে নিজের ভালবাসার কথা জানিয়ে নিজের কাছে টানার চেষ্টা করে। বরুণের ভালোবাসার প্রস্তাব প্রথমে দীপিতা রাজি না হলে বরুণ ভোজালি দিয়ে তার গলা কেটে নামিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। গলা কাটার ভয়ে শেষ পর্যন্ত দীপিতা বরুণের ভালোবাসা গ্রহণ করেন। উগ্র মেজাজের ছেলে বরুণকে দীপিতার পরিবার মেনে নিতে না চাইলে সে একটি তীক্ষ্ণ ভোজালি দীপিতার হাতে দিয়ে সেটিকে তার পরিবারকে দেখানোর কথা বলেন। বাবা-মা মরা মেয়ে দীপিতা মামার সংসারে মানুষ হয়।তার মামাতো ভাই দিবাকর পার্টির ক্যাডার বরুণকে কোন মতেই মেনে নিতে পারে না, তাই সে বরুণের খারাপ দিকগুলি নানাভাবে প্রমিতের সামনে তুলে ধরে, যাতে প্রমিত দীপিতাকে বিয়ে করে সেই উগ্র মেজাজের ক্যাডারের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেন। দীপিতার সাথে বরুণের মিলামেশাতে দিবাকরের বাবা কোনো আপত্তি তোলেন না। কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হলেও দিবাকরের বাবা। তার পার্টির বোল্ড ক্যাডার হিসেবে বরুণের পরিচিতি। তাই ভয়ে দিবাকরের বাবা ভাগ্নি দীপিতার সাথে বরুনের মেলামেশাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই গল্পে রাজনৈতিক ভাবনা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমিত ও দীপিতার বিয়ের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে চলে আসে। 'কারাগার' নামকরণের মধ্য দিয়েও রাজনৈতিক ভাবনার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

দীপিতাকে নিয়ে দিবাকরের এহেন কথা রোজ শুনতে শুনতে একদিন প্রমিত বলে উঠে, দিবাকরইতার প্রকৃত অভিভাব, কারণ সে দীপিতার জীবন সম্পর্কে যত শঙ্কিত, ওর মামা-মামি তার দশ ভাগের এক ভাগও সেই বিষয়ে ভাবেন না। দিবাকর সম্পর্কে প্রমিতের এই কথা শোনার পর সে বলে ওঠে, তার বাবা কিছুটা আলগা স্বভাবের মানুষ। মেয়ে কার সঙ্গে, কিভাবে মেলামেশা করছে, তা দেখেও না দেখার ভঙ্গি বা ভান করে থাকেন। মেয়েকে এই না দেখার ভঙ্গি শুধু যে তার উদাসীনতার পরিচয় ঠিক তা নয়, তিনি বরুণের উগ্র মানসিকতাকে ভয় পান।বরুণ তার পার্টির লোক, চিরকাল ধরে সে কমিউনিস্ট পার্টি করে

আসছেন। গল্পকথকের সময়ে এই পার্টিতে বরুনের মতো অনেক উগ্র মেজাজের ছেলেরা প্রবেশ করেছে, এরাই এখন এই পার্টির বোল্ড ক্যাডার। পার্টির জন্য এরা যেকোন সময় নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিতে পারে। তাই পার্টি তার নিজের প্রয়োজনে বরুণদের মতো ক্যাডারদের যত্ন করে পুষে রাখে, পার্টি কোনভাবে এদের হাতছাড়া করতে চায় না।কমিউনিস্টের ছত্রছায়ায় বড়ো হয়ে উঠা বরুণের উগ্র ভাবনার কথা প্রমিত দিবাকরকে পার্টির উপরের নেতৃত্বকে বলার কথা বলেন। তার এই কথা শুনে দিবাকর হাসি মুখে বলে উঠে---

> ''বাবাই তো নেতা, আর কাকে বলতে যাব আমি। উপরের নেতারা তো বাবার কাছেই ঘটনার ডিটেলস চাইবে।''[৪]

উপরের নেতারা বরুণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা কিছু না বলে এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যায়। তার বাবার এই এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে আর কেউ সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, সকলেই সেই বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। দিবাকরের এই কথা শুনে প্রমিত বরুণের এই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে তাকে সরাসরি দীপিতার সাথে কথা বলতে বলে।

গল্প আলোচনার পরিশেষে একথা বলা যেতেই পারে, গল্পে আবুল বাশারের রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় যথার্থ পরিমাণে পাওয়া যায়। এস.ইউ.সি.আই ও নকশাল এই দুই বাম দলকে আবুল বাশার খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই দুই দলের প্রতিচ্ছবি তাঁর নানা গল্পে ফুটে উঠেছে।লেখকের সমকালীন রাজনীতি চাওয়া পাওয়ার রাজনীতি ছিল না, তা ছিল আত্মত্যাগের রাজনীতি।বামপন্থী রাজনীতি বলতে গল্পকার বুঝতেন চাষির সাথে থেকে, শ্রমিকের সাথে থেকে লড়াই করা, তাদের হয়ে সোচ্চার হওয়া। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই ধারনার মধ্যে পরিবর্তন আসে। স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, নিজ আখের গোছানর মতো প্রবৃত্তি নেতা-কর্মীদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগে। এসবেরই এক প্রতিচ্ছবি আবুল বাশার তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। 'শ্রেষ্ঠ গল্প', আবুল বাশার, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২
২। 'একটি খামে ভরা কাহিনী', আবুল বাশার, সৃষ্টি প্রকাশক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৯
৩। 'একই বৃন্তে ' , আবুল বাশার, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০
৪। 'একটি খামে ভরা কাহিনী', আবুল বাশার, সৃষ্টি প্রকাশক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। 'কালের পুত্তলিক' (বাংলা ছোটগল্পের একশ বিশ বছর ১৮৯১-২০১০) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮২
২। 'স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম-মানস', বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০২০
৩। 'নকশাল বাড়ি: তিরিশ বছর আগে এবং পরে', আজিজুল হক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

সাক্ষাৎকার:

১। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকার, 'বইয়ের দেশ', জানুয়ারি ২০১৯

পত্রিকা:

১। 'আদরের নৌকা' সম্পাদক অভীক দত্ত, প্রকাশিত আদরের নৌকা বইমেলা সংখ্যা ২০০৮